তৃতীয় অধ্যায়

ডিমাছাদের ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ সন্ধান

মানবসমাজের একটি বৃহৎ জায়গা জুড়ে রয়েছে ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে ধর্মাচারণ অতিপ্রাকৃত শক্তিকে প্রসন্ন করা বা আত্মনিবেদন করার ভাব থেকে আসে। আদিম সমাজেও ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল সর্বজনীন। বস্তুত মানুষকে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে নিবদ্ধ করার জন্য আবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদনই হল ধর্ম।

আবার অ্যান্ড্রু ল্যাঙ বলেছেন— ধর্ম প্রত্যক্ষ হয় উচ্চ দৈব বিশ্বাস থেকে৷ ধর্ম বিশেষ সময়ের বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বিশ্বাস-ভিত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্মের মানসভাব অভিব্যক্ত হয় আচার ও বিশ্বাসরূপে। নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে কিছু ক্রিয়া সম্পাদনাই হল আচার, যা পালনকারীর সঙ্গে অনৈসর্গিক শক্তির মধ্যস্থতা করে দেয়। আবার বিশ্বাসগুলো আচারকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে।

পৃথিবীর বহু আদিবাসী সমাজ তাদের নিজস্ব কিছু আচার পদ্ধতির মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে সংযোগ ও আত্মনিবেদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। তারমধ্যে বেশ কিছু প্রভাবশালী ধর্মীয় পন্থা বা ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে ঘটে চলেছে বিবর্তন। তা সত্ত্বেও আদিবাসী সম্প্রদায় নিজস্ব কিছু পারলৌকিক বা অতিলৌকিক সংস্কার এখনও অব্যাহত রেখেছে।

ডিমাছা সমাজের ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ উদঘাদনের ক্ষেত্রে তাদের ইতিহাসের দিকটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিমাছা সমাজে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বৃহত্তর কাছাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ হিন্দুধর্মের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ডিমাছা সমাজও এই ধর্মীয় বিশ্বাসের

অনুসারী। ডিমাছা সমাজে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে মাইবাঙে রাজত্বকালে।

> ***"The process of Hinduization had, probably, already commenced at Maibong, at least among the royal family and the court."*** [১]

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৫৩৫খ্রীঃ) উত্তর কাছাড় অধুনা ডিমা হাসাও মহকুমার মাহুর নদীর তীরে মাইবাং নামক স্থানে ডিমাছাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। ডিমাপুর থেকে মাইবাঙে রাজপাট স্থানান্তরিত হবার পরই ডিমাছাদের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব পড়ে৷ এই প্রভাব আরও তীব্রতর হয় খাসপুরে বসবাসকালে।

> ***"At Khaspur it (Hinduization) proceeded rapidly, and in 1790, the formal act of conversion took place; the Raja Krishna Chandra and his brother Govinda Chandra, entered the body of copper effigy of a cow."*** [২]

তবে মাইবাঙে রাজত্বকালে রাজা সুরদর্প নারায়ণের সময় রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা দেবী হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

> *"জনশ্রুতি রয়েছে যে জনৈক সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুসারে হিন্দুধর্মানুসারে রাজা হরিশচন্দ্রের শিব উপাসনার পরে কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম হয়।"*[৩]

পরবর্তীতে খাসপুরে রাজত্বকারেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র

হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গৌড়দেশ থেকে বারোজন (১২) কুলীন ব্রাহ্মণ এনে নিজরাজ্যে স্থাপন করেছিলেন। হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীহট্ট থেকে খাসপুরে আগত ব্রাহ্মণরা ডিমাছা রাজাদের কাছ থেকে জলগ্রহণ করতেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এর কারণ জানতে চাইলে বলা হয় যে যদিও ডিমাছারা ভীমসেনের বংশোদ্ভূত কিন্তু মাতৃকুল অনার্য (হিড়িম্বা) , এই মাতৃদোষের কারণেই ডিমাছা রাজারা হিন্দুসমাজে সর্বতোভাবে হিন্দু বা নিষ্ঠাবান পিতৃধর্মাবলম্বী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন না। তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের পরামর্শে মাতৃদোষের উপসম করেন 'হিরিণ্যগর্ভ' মহাদান যজ্ঞ-এর মধ্য দিয়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মাইবাঙে শাসনকালে ধর্মান্তকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা পুরোপুরি বিস্তারলাভ করেছিল খাসপুরে এসে। তবে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতার কারনে এই উপজাতি সমাজের একাংশ ধর্ম বিষয়ক কাজে পৃথক হয়ে যায়। সমতল কাছাড়ের বসবাসকারী ডিমাছাদের ধর্মাচরণ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং উত্তরাংশের বাসিন্দারা ধর্মে হিন্দু হলেও তাদের ধর্মাচরণ দেশীয় পুরোহিত দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে৷ অর্থাৎ তাদের পূজা-অর্চনা, ধর্মীয় অনুশাসনে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যগত তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিই বজায় থাকল। তাই এখানে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্তে আদিম অনার্য পদ্ধতিই পালিত হয়। সমতল কাছাড়ে অবশ্য বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা-পদ্ধতি ব্রাহ্মণের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সমাপন হয় কিন্তু পার্বত্য এলাকায় উপাস্য দেবী দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য হাঁস, মুরগী, পায়রা, পাঁঠা, ডিম, মহিষ ইত্যদি উৎসর্গ করা হয়। গার্হস্থ্য ও সর্বজনীন দুই ধরণের পূজোতেই বলি, পশুপাখির রক্তস্রাব দেখে পূজোর সুফল, কুফল নির্ণয় করা হয়। এবং এই ধর্মাচার পালনে তারা রক্ষণশীল, সচেতন ও অনড়৷

ধর্মীয় অনুষঙ্গ, ধর্মভাবনা, ধর্মাচার এগুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে

আছে লোকপুরাণ। উপজাতি সমাজে দেখা যায় লোকপুরাণ থেকেই তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো উদ্ভুত হয়েছে। এরকমই একটি সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের কাহিনির মধ্য দিয়ে ডিমাছাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

"অতি প্রাচীনকালে এই পৃথিবীতে যখন জনবসতি ছিল না, তখন পৃথিবীর আকারও ছিল অন্যরকম। এক মহা নিস্তব্ধতা পৃথিবীতে বিরাজ করছিল। কালক্রমে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভগবান প্রদত্ত দুই মানব-মানবীর আবির্ভাব হয়। পুরুষের নাম বাংলারাজা আর মহিলার নাম আরিখীডিমা। জনহীন জগতে এই পুরুষ ও মহিলা একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হলেন এবং বাংলারাজার ঔরসে আরিখীডিমা গর্ভবতী হলেন। বাংলারাজা হলেন ভূমিকম্পের দেবতা আর আরিখীডিমা ভীষণ বড় পাখির মতা আরিখীডিমার গর্ভাবস্থা পূর্ণ হলে পৃথিবীতে সন্তান প্রসব করার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল ডিলাওব্রা-সাংগীব্রাই (ডিলাও এবং সাংগী নদীর সংগমস্থল) আরিখীডিমার সন্তান প্রসবের উপযুক্ত জায়গা।

আরিখীডিমা স্বর্গতুল্য এই ডিলাংব্রা-সংগীব্রাতে সাতটি ডিম প্রসব করলেন। প্রথম ডিম থেকে জন্ম হলো শিবারাই, দ্বিতীয়টি থেকে ডু-রাজা, তৃতীয়টি থেকে নাইখুরাজা, চতুর্থটি থেকে ওয়ারাজা, পঞ্চমটি থেকে গনইয়ুং ব্রাইয়ুং এবং

ষষ্ঠ ডিম থেকে হাময়াদাও। এরা সবাই মানবরূপী দেবতা। কিন্তু সপ্তম ডিমটি তখনও একই অবস্থায় থাকল। আরিখীডিমা এতে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি পুত্রদের ডিমটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেউই তা ভাঙার সাহস পাচ্ছিলেন না। তাদের মধ্যে হাময়াদাও ছিলেন সাহসী প্রকৃতির। তিনি সাহস করে ডিমটি ভেঙে ফেলার সাথে সাথে অস্বাভাবিক কিম্ভুতকিমাকার কিছু ভূত-প্রেত বেরিয়ে এল। এই অপদেবতারা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাইলে বড়দাদা শিবারাইয়ের চেষ্টায় তারা শান্ত হল। তবে তাদের থাকার জন্য আলাদা জায়গা নির্ধারিত হল। এই কাহিনি অনুসারে বাংলারাজা এবং আরিখীডিমার ছয় পুত্র সন্তানই ডিমাছাদের উপাস্য দেবতা। শিবারাই (শিব) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং সপ্তম ডিম থেকে সৃষ্ট অপদেবতারা মানুষের অমঙ্গল, রোগ-শোক তথা সমস্ত রকমের দুর্যোগের কারণ।”[৪]

এই বিশ্বাসবোধ এখনও ডিমাছাদের মধ্যে অটুট রয়েছে। এই অশুভ শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও আচার অনুষ্ঠান পালন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে শাক্তধর্মে বিশ্বাসী ডিমাছারা প্রধানত শিবারাই (শিব), গামাডির (দুর্গা) উপাসক হলেও অপদেবতার তুষ্টিবিধানে বা পূজার্চনায় পূর্বপুরুষের প্রচলিত তান্ত্রিক পদ্ধতিকেই মেনে চলেছে। তবে কৃষ্ণচন্দ্রের সময়

রণচণ্ডী, শ্যামা, কাঁচাকান্তি, শিব, লক্ষ্মী-নারায়ণের দ্বাদশচক্র প্রভৃতি দেবদেবীও পূজিত হতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি পূজক নিয়োগ এবং দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান করে কাছাড়ে আর্যধর্মে এক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মাইবাঙে ডিমাছা রাজপরিবারে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেও তাদের ধর্মপ্রত্যয় ছিল তন্ত্রমন্ত্রসদৃশ। তাই আদি ধর্মাচারও বিসর্জিত হয়নি। এখনও পর্যন্ত ডিমাছা সমাজ ও সংস্কৃতিতে আদি ধর্মাচার বহমান। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় মূর্তিপূজার পরিবর্তে কোন প্রতীক বা চিহ্নকে পূজা করার প্রচলন রয়েছে।

> ***"In the typical Kachari village as a rule neither idol nor place of worship is to be found; but to the Kachari mind and imagination earth, air, and sky are alike people with a vast number of invisible spiritual beings, known usually as 'Madai', all possessing powers and faculties far greater than those of man and almost invariably inclined to use these powers for malignant and malivolent, rather than benovalent, purpose."***[৫]

মাইবাং ও খাসপুরে শাসনকালেও রণচণ্ডী মন্দিরগুলোতে কোন দেবীমূর্তি ছিল না। রণচণ্ডী মন্দিরে দেবমূর্তির পরিবর্তে তরবারী (প্রতীক) পূজার প্রসঙ্গে ডিমাছা অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। কাহিনিটি হল—

"একদা স্বপ্নে নির্ভয়নারায়ণ শুনিলেন যেন জগজ্জননী বলিলেন, 'বৎস! কল্য নদীতে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।' পরদিন রাজা একা নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন একটি বিষধর জলকেলী করিতেছে। নির্ভয়নারায়ণ সর্পকে রণচন্ডী জ্ঞানে তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ একখানি তরবারী রাজার হস্তে উঠিল। নরপতি সেই তরবারী লইয়া গৃহে গমণ করিলেন। সেই দিবস রজনী যোগে দেবী পুনর্বার নির্ভয়নারায়ণকে বলিলেন, 'বৎস! সর্পের লাঙ্গুলে ধরিয়া অন্যায় করিয়াছ, যাহা হউক এই তরবারী যত্নের সহিত রক্ষা করিও, ইহার কৃপায় তোমার বংশধরগণ নির্বিঘ্নে কাছাড় রাজ্য উপভোগ করিবে।" কাছাড়পতিগণ ভক্তির সহিত সর্বদা এই তরবারীকে 'রণচণ্ডী' জ্ঞানে পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে, যে দিবস গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের হত্যাকান্ড সম্পাদিত হয় সেই দিবস ওই তরবারী রাজপ্রাসাদ হইতে অপসৃত হইয়াছিল।"[৬]

"ডিমাছা সমাজে 'রণচণ্ডী'র ধারণার মধ্যে হয়তো নিহিত রয়েছে যুদ্ধের আবর্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙক্ষা। কারণ যুদ্ধের সঙ্গে রাজাদের বারবার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই যুদ্ধ তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তাই আত্মরক্ষা ও যুদ্ধজয়ের আর্তি থেকেই ডিমাপুর রাজপরিবারে 'গামাডি' (দুর্গা)

'রণচণ্ডী' (অস্ত্র/তরবারী) হিসেবে কল্পিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়।"[৭]

ডিমাছারা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও তাদের ধর্মাচরণে কিছু কিছু ঐতিহ্যগত নিজস্ব অনার্য ধারাও গৃহিত হয়। ডিমাছারা সকলেই পরম্পরাক্রমে ব্রাইশিবারাই (শিব), গামাডি (দুর্গা), চন্ডী (রণচন্ডী), হেরমডি (হৈড়ম্বেশ্বরী), আলোরাজা, ডাইংকাও, ডিছাইম, মুংগ্রাং, ডিলাওজু, কাছাইম, ছামরিয়াম, ফাইনস্‌নিডি আদি দেবদেবীর পূজার্চনা করে। ডিমাছা সমাজে প্রচলিত কয়েকটি পূজা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

গেরবা : গেরবা পূজা বছরে একবার করা হয়। মাডাই হেরমডি (হিড়িম্বেশ্বরী) এই পূজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই পূজা বছরের মাঘ-ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে করা হয়। 'হজাই' (পুরোহিত) পূজোর আগের দিনই গ্রামের পথ মন্ত্রবলে বন্ধ করে রাখে। অর্থাৎ সেইদিন গ্রামে অন্য গ্রামের লোকেদের প্রবেশ নিষেধ। গ্রামের মঙ্গলার্থে, কোনো ধরণের রোগ, মহামারি যাতে গ্রামের লোকের ক্ষতি করতে না পারে তাই এই পূজার আয়োজন। এই পূজা মূলত বারোয়ারি। রাত্রিবেলা গ্রামের রাস্তায় এই পূজা করা হত। তবে জায়গা বিশেষে মন্দিরে এই পূজা করা হয়। বর্তমানে সমতল কাছাড়ের অধিকাংশ গ্রামে দেবীমন্দিরে এই পূজা করা হয়।

হাসং পূজা : এই পূজা পার্বত্য অঞ্চলে হয়ে থাকে। জুমখেতে যখন ধানের শিষ দেখা দেয় তখন এই পূজা করা হয়। পূজোর আগের দিন পূজারী গ্রামের লোকালয় থেকে দূরে কোনো গাছের তলায় ঘাস পরিষ্কার করে বাঁশের মাচা তৈরি করেন। পরেরদিন পূজারী স্নান করে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে পূজার উপকরণ নিয়ে পূজার স্থানে আসেন। উপকরণগুলি হল— খুদ, বাঁশের চোঙ, মোরগ। তারপর বাঁশের তৈরি মাচাকেই দেবী জ্ঞানে

তার সম্মুখে তিনটি কলাপাতা এবং মাচার ওপরে সাতটি কলাপাতা রাখা হয়। কলা পাতায় প্রত্যেক উপকরণ সাজিয়ে 'জুডি' (লাউপানি) ছিটিয়ে পূজা করা হয়। সমস্ত রকমের আয়োজন শেষ হলে পূজারী 'হাসং' দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে মোরগ বলি দেয়। মোরগের রক্ত প্রত্যেকটি কলাপাতায় উৎসর্গ করার পরই হাসং পূজা সমাপ্ত হয়।

লাংলাই পূজা : অনাবৃষ্টি বা 'খরা' দেখা দিলে ডিমাছারা এই পূজা করে। এই পূজা অতি সাধারণভাবে করা যায় আবার আড়ম্বরপূর্ণভাবেও করা যায়। লোকচক্ষুর বাইরে জঙ্গলে এই পূজা করা হয়। পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ হল ডিম, মোরগ, পাঁঠা, সাদা বিশুদ্ধ বস্ত্র, কলাপাতা ইত্যাদি। পূজার জন্য বেদিও সাজানো হয়। এই পূজা করার উপযুক্ত সময় বা দিন হল মঙ্গলবার বা শুক্রবার।

মংরাং, টেলেংগা এবং ডিয়ালাউ পূজা : ডিমাছারা 'মংরাং' দেবতাকে ব্রাইশিবারাই (শিব)-এর পুত্র গণেশ জ্ঞানে পূজা করে। টেলেংগা, ডিয়ালাই হচ্ছেন গণেশের ভাতৃদ্বয়। তাই 'মংরাং' পূজা করলেই তাঁর ভাতৃদ্বয় টেলেংগা, ডিয়ালাউ-এরও পূজো দিতে হয়।

মাডাই-সাঁগাই পূজা : ডিমাছারা বিশ্বাস করে যে, আদিতে সৃষ্টিকর্তা বাংলারাজা আর তাঁর স্ত্রী আরিখীডিমার সাতটি ডিম থেকে ছয়জন দেবতা আর একটি ডিম থেকে অপদেবতার জন্ম হয়েছিল। এই ছয়জন দেবতারা হলেন ক্রমে 'ব্রাই শিবারাই', 'ওয়ারাজা', 'দুরাজা', 'নাইখুরাজা', 'বংয়ুং ব্রাইয়ুং', 'মংরাং' এবং 'হাময়াদাও'। সপ্তম ডিম থেকে উদ্ভুত অপদেবতাদের মধ্যে রয়েছেন 'মাডাই দাখিন', 'সাগাইনজিক' (ডাইনি), 'জাপামা', 'মাডাই ডিলাউজিক' ইত্যাদি। বিভিন্নরকম অসুখবিসুখ থেকে রক্ষা পেতে এই অপদেবতাদের পূজা করা হয়।

মাদাই দাখিন : এই অপদেবতার কু-দৃষ্টির ফলে পেটের যন্ত্রণা দেখা দেয় বলে ডিমাছারা বিশ্বাস করে। প্রথম অবস্থায় মন্ত্র, ঝাঁড়-ফু দিয়ে প্রতিকার করার চেষ্টা করা হয়। তাতেও যদি না কমে তাহলে মাদাই দাখিন অপদেবতার পূজা করার আয়োজন করা হয়। এই পূজায় প্রয়োজনীয় উপকরণ হল হরিণরঙের পাঁঠা নতুবা মোরগ।

সাঁগাইজিক : এই অপদেবতা সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে বলে ডিমাছাদের বিশ্বাস। তাই ডিমাছা সমাজে সন্ধ্যেবেলা মহিলা, শিশু-কিশোরীরা ঘরের বাইরে বেরোয় না। না হলে সাঁগাইজিক মানুষের শরীরে ভর করে বলে বিশ্বাস করে। এই অপদেবতাকে একটি ডিম অথবা মোরগ কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আস্ত পাঁঠা বলি দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়।

জাগামা : জাগামা অপদেবতা ডাইনি বা সাঁগাইজিক-এর সমগোত্রীয়। কেউ যদি ভয় পেয়ে অচৈতন্য হয় তাহলে 'জাগামা'র কুনজরে পড়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। তবে শরীরে এই অপদেবতা ভর করেছে কিনা তা নির্ধারণ করে ডিমাছা হজাই।

মাডাই ডিলাউজিক : এই অপদেবতা 'দুরাজা' দেবতার বোন এবং ডিলাউ--র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কেউ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে তার আরোগ্য লাভের কামনায় ডিলাউজিক পূজা করা হয়। মঙ্গলবার কিংবা শুক্রবার দিনে এই পূজা করা হয়। পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ হল— পাঁচটি কবুতর এবং একটি পাঠা। রোগী যদি অতিমাত্রায় অসুস্থ থাকে তাহলে একটি সাদারঙের পাঁঠা এবং আট-জোড়া কবুতর 'জাগামা' অপদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। সকাল দশটা থেকে বারোটার (বারবেলা) মধ্যে পূজা পদ্ধতি শেষ করতে হয়।

ডিমাছা সমাজের ধর্মীয় অনুশাসনে কিংবা ধর্মীয় সংস্কারে নিজস্ব

অনার্য ধর্ম প্রবহমান হলেও পাশাপাশি হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন পূজা, সংস্কারও প্রচলিত। সমতল অঞ্চলে ডিমাছারা শিব ও শক্তির উপাসনাও সমান্তরালভাবে করে চলেছে। তাই সমতল কাছাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে শিব ও শক্তির মন্দির। যেমন— কাছাড়ের বড়খলায় 'নিমাতা' মন্দির, খাসপুরে 'সিয়ামা' (ছিয়ামা, শ্যামা), উধারবন্দে 'কাঁচাকান্তি', জয়পুরে 'শিবস্থান', সোনাই-এর 'শিবমন্দির'। এই প্রত্যেকটি দেবদেবী মন্দির রাজা হরিশচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এইসবমন্দির এবং দেবদেবীর প্রাধান্য ডিমাছা সমাজে প্রবল এবং ব্যাপক। বড়খলার 'নিমাতা' বাড়ির প্রসঙ্গে একটি জনশ্রুতি রয়েছে—

> *"খাসপুরে প্রথম ডিমাছা কাছাড়ী রাজা হরিশচন্দ্র (১৭৫৫-১৭৮০) একদিন স্বপ্নে দেখেন যে তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া হাতির সন্ধান পেয়েছেন। তখন দেবী 'নিমাতা' স্বপ্নে রাজাকে বললেন যে, তিনি তাঁর হাতির সন্ধান দিতে পারেন কিন্তু তার বিনিময়ে রাজাকে একটি দেবগৃহ বানিয়ে সেখানে প্রত্যহ দেবী 'নিমাতা'কে পূজো করতে হবে। অন্যদিকে দেবী এক ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন সেই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে দেবীর পূজো করেন।"*[৮]

আজও সেই অঞ্চলে ডিমাছারা প্রতিদিন সেই মন্দিরে পূজো করেন। এবং যে-কোনো শুভকাজ কিংবা মাঙ্গলিক কাজের পূর্বে সেই মন্দিরে পূজো করে।

ডিমাছা সমাজের অন্যতম আরাধ্যা দেবী হলেন 'ছিয়ামা'। এই 'ছিয়ামা'

(শ্যামা) দেবী প্রথম পূজিতা হয়েছিলেন ধেয়ান বা কোচদের দ্বারা। পরবর্তীতে ডিমাছারাও এই দেবীকে আরাধনা করতে শুরু করেন।

> ***"The Kacharis conceived her as a tribal goddess. They later introduced Hindu rituals to worship her perhaps to elevent her status as Hindu Goddess."*** [৯]

এখন শুধু ডিমাছারাই নয় বাঙালি, ধেয়ান, পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ নির্বিশেষে এই দেবীর পূজা করেন। এমনকী ডিমাছাদের 'গেরবা' বা গ্রামপূজা এখনও এই শ্যামা বা ছিয়ামা মন্দিরে সম্পন্ন হয়।

ডিমাছা সমাজে প্রথম মূর্তি পূজার প্রচলন হয় 'কাঁচাকান্তি' দেবীপূজার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ***"After celebration of the Hiranyagarbha mahadana Krishna Chandra dreamt a dream sometime in 1806 that he should construct a temple for worshiping one of the terrifying forms of devi.***
>
> ***...The Dimasa Kacharis it appears, introduced the worship of Kachakanti in 1806 following a dream of Krishnachandra a stated here and might have introduced the annual human sacrifice to propitiate her."*** [১০]

কাছাড়ি রাজপরিবার শৈবধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। এছাড়াও কাছাড়ি রাজপরিবার বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাজসভায় প্রতিদিন ভাগবৎ পুরাণপাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মনিপুর রাজকন্যা ইন্দুপ্রভাকে বিয়ে করেন। ফলে কাছাড়ি রাজপরিবার বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছিল।

> ***"In fact, Kachari King's inclination to Vaisnaba saints was first noticed when a royal messenger was sent to invites Sankardeva, the founder of neo-Vaisnavision in Assam to visit the Kachari Kingdom."*** [১১]

তবে বৈষ্ণবধর্ম ডিমাছা সমাজে পরবর্তীসময়ে ততটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই উপজাতিগোষ্ঠী হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সংস্কারের অনুসারী হওয়ার পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্যগত কিছু ধর্মীয় আচার, সংস্কার, রীতি-নীতিকেও বহন করে চলেছে।

(খ) তন্ত্র ভাবনা :

মন্ত্রের চর্চা এবং এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। মন্ত্রের মূল বিষয় হলো বিশ্বাস। মানুষ বিশ্বাস করে যে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে কোনো বিপদ, অসুখ ইত্যাদির কবল থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তীতে জীবজন্তু, পশুপাখি কোনো দেব-দেবীর পূজায় বলি দেওয়া হয়। এইসব প্রক্রিয়া সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন— জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। এই প্রার্থনার সঙ্গে পূজার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে ছন্দোবদ্ধ বাক্য এবং বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়া।

ডিমাছা ঐতিহ্যে তন্ত্র সাধনার এক নিদর্শন হল 'ফাতৃ' বা গণৎকার। রোগ-শোক, ভাল-মন্দ, সৌভাগ্য সর্বোপরি মঙ্গল অমঙ্গলের কারণ এবং তার প্রতিকার ইত্যাদির জন্য 'ফাতৃ'র প্রতি বিশ্বাস ডিমাছা সমাজে বহু প্রাচীন।

> *"ডিমাসা সমাজে সাধারণ গণনার জন্য ঈশ্বর বা পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ফাতৃ গারিবা' অর্থাৎ 'ফাতৃ' ভর করানো। ডিমাছারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে 'স্মা নাইরিবা' করেন। কিন্তু সমাজ, জাতি, দেশ, জুলু (মাতৃকুল), সেংফং (পিতৃকুল) ইত্যাদি অর্থাৎ সমষ্টিগত প্রয়োজনে 'ফাতৃ গারিবা' করেন। পদ্ধতিগত দিক দিয়ে এগুলি সম্ভবত তন্ত্র ও যোগের প্রভাব প্রসূত।"*[১২]

অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে জাতির, গ্রামের মঙ্গল-অমঙ্গল সংক্রান্ত জ্যোতিষ গণনার প্রক্রিয়াকেই 'ফাতৃ গারিবা' বলা হয়। এই বিশেষ গণনা ডিমাছা সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।

'ফাতৃ গারিবা' অর্থাৎ ফাতৃ ভর করানো। একজন ব্যক্তি বিশেষের শরীরে এসে ফাতৃ ভর করেন। কবি ও প্রাবন্ধিক কুমুদ চন্দ্র বড়ো 'ফাতৃ'র যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> *"ফাতৃ (ফাথিরি) দেবের প্রচারকদের সংস্কৃতে 'হোতৃ' বলা হয়। 'হ' হল হং-য়াবা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরামহীনভাবে ধ্বনিত হওয়া শব্দ-ব্রহ্ম। তাই হ = ব্রহ্মা, তৃ = থিরিয়াবা (যিনি*

বলে দেন); অর্থাৎ ব্রহ্মার কথাকে বলে দেওয়া,
হ (ব্রহ্মা) + থিরিয়াবা = হথিরি > হোতৃ। ফা
ফাইয়াবা (আগত), হোতৃ থেকে আগত 'ফাতৃ'।"[১৩]

আবার বিশিষ্ট ডিমাছা প্রাবন্ধিক বিশ্বজ্যোতি বর্মণ 'ফাতৃ'র ভিন্নতর ব্যাখ্যার সম্ভাবনার কথা বলেছেন এভাবে—

ফা = বুফা (পিতা) অর্থাৎ ব্রহ্মপিতা
তৃ = থিরিয়াবা (যিনি বলে দেন)
ফা + থিরি = ফাতৃ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মপিতার কথা বলে দেন।

'ফাতৃ গারিবা' অনুষ্ঠানের পরিচানক হলেন 'হজাই' এবং জঠাই (মুখ্য পুরোহিত)। যার দেহে ফাতৃ ভর করানো হয় তাকে অনেক কঠোর নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। দেহ ও মনের শুচিতা রক্ষা হেতু তারা অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ব্যবহার করে না। যেখানে সেখানে আহারগ্রহণ করেন না এমনকী চুল কাটাও নিয়ম বহির্ভূত। লম্বা চুল ঝুটি বেঁধে রাখা হয় এবং ফাতৃ ভর করানোর সময় সেই চুল বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ডিমাছা তন্ত্র সাধনার অন্যতম প্রচলিত রীতি হল 'স্মানাইবা'। 'স্মা' হল ডিমাছা ভাষায় প্রশ্নবোধক শব্দ। এই জনজীবনে সাধারণ লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত, শারীরিক, মানসিক, রোগ-শোক ইত্যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে গণৎকারকে প্রশ্ন করেন, এবং কোনো সমস্যা থাকলে তা নিরসনে পথনির্দেশ করেন এই গণৎকারেরা। তারপর প্রয়োজন অনুসারে প্রতিকার করা হয় গণৎকারের সহায়তায়। ডিমাছা প্রাবন্ধিক সরোজ কুমার বর্মণ এই 'স্মা'র মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

"প্রশ্ন (স্মা) হল বেদের অনেক নামের মধ্যে একটি। সুগভীর জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মহিমা এবং মানবজীবনের দৃঢ় তত্ত্বগুলোকে সাম বা স্মার মাধ্যমে সাম বেদের শ্লোকগুলোয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরও বলতে হয়, স্মা-রূপী জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের বাস্তব প্রক্রিয়াটি প্রশ্নোপনিষদ ও কেনোপনিষদগুলোতে শাস্ত্রীয় প্রামাণিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।"[১৪]

এই 'স্মা নাইরিবা' একধরনের গুহ্যবিদ্যা। এই অনুষ্ঠানে হজাই এবং জন্ঠাইকে সহযোগিতা করেন একজন বারওয়া (সহকারী) ও ডাঁইয়া (বলিদানকারী)। এই পূজায় শিব্রাই সহ বিভিন্ন দেবদেবীর আবাহন করা হয়। জন্ঠাই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবদেবীর আবাহন করেন। এই পূজার এক অপরিহার্য অঙ্গ হল খ্রাম (ঢোল) মুরি (বাঁশি)। পূজার সময় জন্ঠাই লম্বা চুল উন্মুক্ত করে হাতে 'সেং' (তরবারি) নিয়ে ঢোল আর বাঁশির তালে তালে নৃত্য করতে করতে পূজাস্থলে প্রবেশ করেন। প্রথমে জন্ঠাই পূজায় পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে কিনা দেখেন তারপর যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তাহলে সংশোধন করিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

ফাতৃ গারিবার জন্য দেবদেবীর আরাধনার পাশাপাশি নিবেদন করা হয় ভোগ। বাঁশের কঞ্চিতে সলতে জড়িয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। খোলা-উন্মুক্ত জায়গায় কলাপাতা দিয়ে বেদী তৈরি করে দেবদেবীর আবাহন করা হয়। সাতটি কলাপাতা সাজিয়ে এর উপর নিবেদিত হয় 'জুডিমা' বা লাউপাণী ভাত, রান্না করা মাংস। উৎসর্গ করা হয় মোরগ কিংবা কবুতর। জন্ঠাই নিজস্ব

ডিমাছা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তবে ফাতৃদের ভাষা প্রচলিত ভাষা থেকে কিছু ভিন্ন। ছন্দবদ্ধ বাক্যগুলি উপমা সম্বলিত বলে সবসময় তা বোধগম্য হয় না। তাই ফাতৃদের ভাষা 'মাডাইরাওনী গ্রাউ' বা ঈশ্বরের ভাষা বলা হয়। তবে ফাতৃর মন্ত্রোচ্চারণ বা ভবিষ্যৎবাণী ডিমাছা সমাজে আজও খুবই গুরুত্ব সহকারে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে চলা হয়।

ডাঁইখ ১২ (দ্বাদশ দেবতা) :

ডিমাছা সমাজের এক বৃহৎ জায়গা জুড়ে রয়েছে ডাঁইখ ১২ বা দ্বাদশ দেবতা। এই দ্বাদশ দেবতা নিরাকার। ডিমাছারা বিশ্বাস করে যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দেবতা সেই অঞ্চলের মানুষ, রোগ-শোক, ভাল-মন্দ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক একটি ডাঁইখ হিসেবে বিবেচিত হয়।

> ***"In erlier times the whole Dimasa land was divided into twelve religious daikhos; the people believed that Gods and Goddesses residing in a particular daikho protect the people of that area and control teir destiny."*** [১৫]

এই দ্বাদশ দেবতার নাম যথাক্রমে—

১. আলু ডাঁইখ	৭. মিসিম ডাঁইখ
২. বাইগ্লাই ডাঁইখ	৮. রণচণ্ডী ডাঁইখ
৩. হামরি ডাঁইখ	৯. রিয়াও ডাঁইখ (রিয়াও)

৪. লংমাইলাম ডাঁইখ

৫. মানজা ডাঁইখ

৬. মুঙগ্রাং ডাঁইখ

১০. ওয়ালগঙ (ওয়াইব্রা) ডাঁইখ

১১. লঙমাইলাই ডাঁইখ

১২. ওয়া ডাঁইখ

এই ১২টি ডাঁইখ বা দেবতার ১২ জন আলাদা আলাদা জঠাই বা পুরোহিত রয়েছে। এই ১২ জন জঠাইয়ের একজন মুখ্য পুরোহিত থাকেন। যাকে বলা হয় 'গিসিয়া'। ১২জন পুরোহিতের যে কোনো একজনের অশৌচ হলে কিংবা অসুবিধা দেখা দিলে এই মুখ্য পুরোহিত 'ডিথার' (পবিত্র জল) খাইয়ে শুদ্ধিকরণ করেন। নতুন কোনো জঠাই নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এই মুখ্য পুরোহিত বা গিসিয়া।

সার্বিকভাবে গ্রামের মঙ্গল কামনায় অবৈদিক দেব আরাধনার এক স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয় এই ১২টি ডাঁইখ-তে। গ্রামপূজার বিভিন্ন আচার এই ডাঁইখতে সম্পন্ন হয়। এই গ্রামপূজার সময়েই গ্রামের ভাল-মন্দ মঙ্গল বিচার করার জন্য গণনা করানো হয়। যাকে বলা হয় 'ফাতৃ'। এই 'ফাতৃ'ও নির্বাচন করা হয় জঠাইদের মধ্যে থেকেই। এই ডাঁইখ, জঠাই, ফাতৃ, গিসিয়া, হজাই, বারওয়া ইত্যাদি ডিমাছা তন্ত্রসাধনার এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন।

(গ) উৎসব-পার্বণ :

ডিমাছাদের প্রধান উৎসব হল 'বুসু'। ডিমাছা সংস্কৃতি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক জীবনধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি পদ্ধতির মূল হল জুমচাষ। ভূমি, প্রকৃতি শস্য, প্রজননশক্তির প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের উৎসব হল এই 'বুসু' উৎসব। কার্তিক থেকে

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময় এই উৎসব উদ্‌যাপনের উপযুক্ত সময়। নতুন বছরের আগমন এবং বিগত বছরকে বিদায় জানিয়ে আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে এই প্রধান সামাজিক উৎসব পালিত হয়।

একে কৃষকদের মানসিক স্বস্তি ও সঞ্চয়ের উৎসব বললেও সর্বস্তরের মানুষই কয়েকদিন ধরে এই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। প্রায় সপ্তাহব্যাপী চলে এই উৎসব। আর উৎসব মানেই হল আনন্দ, নৃত্য, গীত, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন।

সাধারণত বুসু তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। হাংস, সুরেম ও জিডাব। হাংস বুসু সাতদিন, সুরেম তিনদিন এবং জিডাব বুসু তিনদিন পালন করা হয়। তিনটি বুসু উৎসবের আচার অনুষ্ঠান একই। পার্থক্য শুধু দিনের ব্যবধানের ক্ষেত্রে। বুসু উৎসবে সবাই সমানভাবে অংশ নিলেও উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে যুবক-যুবতী। এক একটি গ্রামে আলাদা আলাদা ভাবে 'বুসু' কেন্দ্রিক নাচগানের আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে থাকে গ্রামের একজন প্রধান যুবক যাকে বলা হয় 'নাগা হোজা' (প্রধান যুবক)। আবার মেয়েদের মধ্যে একজন প্রধান থাকে যাকে বলা হয় 'মাটলা হোজা' (প্রধান যুবতী)। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রবেশদ্বারে নির্মিত হয় বাঁশের তৈরি কারুকার্যশোভিত তোরণ। একে বলা হয় 'ফাংশ্লা'। এই ফাংশ্লাকে ঘিরে নৃত্য, গীত ও শিবারাই (শিব) আরাধনার মধ্য দিয়ে সমবেত 'বুসু' কেন্দ্রিক নৃত্যগীতে প্রাঙ্গন ভরে ওঠে। বুস উৎসব শুরু হয় গ্রামের যে কোনো একজন গৃহস্থের প্রাঙ্গন থেকে। গৃহস্থ 'গ্‌জাইবাউ' নামে পরিচিত।

বুসু উৎসবের প্রথম দিনকে বলা হয় 'সটাইবা'। সেই দিনে পশু বলি দেওয়ার পর নদ্রাঙের আঙিনায় ঐতিহ্যগত নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের

সূচনা করা হয়। পরবর্তী দিনকে বলা হয় যথাক্রমে 'বুসুমা', 'বাইখাওবা' 'জিখাওবা'। বুসুমার দিনগুলোতে গ্রামের বয়স্কদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পালা। তারপর 'লংঠাইলেমবা', 'হারাংবাইবা' ইত্যাদি ঐতিহ্যগত খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। এরপর গৃহস্থ বা 'গ্জাইবাউ' এর বাড়ির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় নৃত্যগীত এবং খাওয়া দাওয়া।

বুসুকেন্দ্রিক নৃত্যগীতের ক্ষেত্রেও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যেমন গ্জাইবাউ বা গৃহস্থের বাড়িতে বুসু অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার চতুর্থ দিন থেকে উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত বাদ্য খারাম (ঢোল), মুড়ি (বাঁশি) বাজতে থাকে৷ এভাবে এক আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ডিমাছাদের ঐতিহ্য পরম্পরা সর্বোপরি সাংস্কৃতিক দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে৷

ডিমাছাদের সমাজ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হল 'সাঁইজোরা' বা সংক্রান্তি। সাঁইজোরা অর্থাৎ মাসের শেষ দিন। স্থানভেদে তিনটি 'সাঁইজোরা' বা সংক্রান্তি পালন করা হয় এবং তাদের ধর্মীয় জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তিনটি 'সাঁইজোরা' বা সংক্রান্তি হল—

১. বাইশাগী সাঁইজোরা বা চৈত্র সংক্রাতি

২. গাডী সাঁইজোরা বা কার্তিক সংক্রান্তি

৩. মাঘ সাঁইজোরা বা পৌষ সংক্রান্তি

বাইশাগী সাঁইজোরা পালনের উদ্দেশ্য হল পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জাননো। নতুন বছর যাতে সবার জন্য মঙ্গলদায়ক হয় তারই কামনা করা হয় এই বিশেষ তিথিতে৷ পার্বত্য অঞ্চলের ডিমাছারা এই সংক্রান্তিতে শিবারাই-এর আরাধনা করে। শিবারাই-এর উদ্দেশ্যে পাঁঠা,

মোরগ কিংবা কবুতর বলি প্রদানের প্রচলন রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে।

ডিমাছা সমাজে গাডী সাঁইজোরা (কার্তিক সংক্রান্তি) এবং মাঘ সাঁইজোরার (পৌষ সংক্রান্তি) প্রাধান্য বেশি। গাডী সাঁইজোরাতে বিভিন্নরকম মাছ-মাংসের তৈরি খাবার তৈরি করে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা একত্রে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। তার সঙ্গে থাকে 'জুডি' (লাউপানি) পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গপর্ব শেষ হওয়ার পর সবাই মিলে চলে খাওয়া-দাওয়া। মাঘ সাঁইজোরা বা পৌষ সংক্রান্তিতেও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রচলন রয়েছে। তবে এই সংক্রান্তিতে অন্য একটি সংযোজন হল ঘরে তৈরি বিভিন্নরকম পিঠে-পুলি। বিশেষ করে সমতল কাছাড়ের ডিমাছাদের ক্ষেত্রেও পিঠে-পুলি তৈরি করার প্রচলন রয়েছে। এই সংক্রান্তিতে রংঠেপ (চিড়া), আঁখি (মুড়ি), আঁখিবুবার (খই), হন মাইব্রেং (চালের তৈরি পিঠা) , হনঠাই (চালের তৈরি সেদ্ধ পিঠা) ইত্যাদি পিঠে বানানোর প্রচলন রয়েছে।

মানুষের মনের কাম্যবস্তু বা কর্মের সাদৃশ্যে আচার অনুষ্ঠান করলে, মনস্কামনা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয় ব্রত। কোনো কিছু কামনা করে লোকসমাজে যে অনুষ্ঠান কিংবা আচার পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা যায়। মানবগোষ্ঠী জীবিকান্বেষণ, আহরণ, পশুপালন, কৃষি ইত্যাদির শুভাশুভ বিচারের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করত। প্রাকৃতিক শক্তিকে খুশি রাখতে কিংবা আকাঙক্ষা পূরণের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে নানাবিধ আচার পালন করত।

লোকসমাজে ব্রতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানব মনের কামনা বাসনাকে সার্থক করার জন্য এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ব্রতের সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, যাদু এইসবের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে সেখানে পুরোহিত কিংবা শাস্ত্র

নির্দেশের কোনো স্থান নেই।

> *"ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চায়, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"*[১৬]

ডিমাছা সমাজে যে-সব ব্রতাচার রয়েছে সেসবই কৃষি সংক্রান্ত ব্রতাচার। এরকমই একটি ব্রত হল 'মাইস্‌লাই' ব্রত। শস্যবৃদ্ধি কামনা করে ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। চাষবাস শুরু করার আগে যে কোনো সোম বা শুক্রবার রাতের বেলা এই ব্রত পালন করা হয়। চাল-ডাল, শাক-সব্জি, টাকা-পয়সা, ডিম, মুরগি ইত্যাদি উপকরণের সঙ্গে ডিমাছা পুরুষরা এই ব্রত পালনে অংশ নেয়। এই ব্রতের বিভিন্ন আচার পরিচালনা করেন 'হজাই'। তাকে সাহায্য করতে একজন সহযোগী থাকেন যাকে 'বারওয়া' বলা হয়। লোকালয় থেকে একটু দূরে খোলা আকাশের নীচে 'ফাঁইসনিডি'র (শস্যের দেবী) পুজোর বেদী সাজানো হয়। ছোট কলাগাছকে সাত টুকরো করে কেটে এগুলোকে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে বেদীর ওপর দাঁড় করানো হয়। এর সামনের সারিতে পরপর কলাপাতা রাখা হয়। 'হজাই' প্রথাগত জপের মধ্য দিয়ে রান্না করা ভোগ (ভাত-মাংস-তরকারি) কলাপাতায়

নিবেদন করেন। পুজোর পর্ব শেষ হলে 'হজাই' রান্না করা ভোগ প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ 'হজাই', 'বারওয়া' ছাড়া এই ভোগ কেউ গ্রহণ করতে পারে না।

ক্রুংফাংনি গেরবা : এই ব্রত প্রত্যেক ডিমাছা গ্রামে বারোয়ারিভাবে পালন করা হয়। ব্রতটি বৈশাখি পূর্ণিমার আগে পালন করা হয়। নতুন বছর যাতে সবার জন্য মঙ্গলজনক হয়, কোন বিপদ যাতে না আসে, গ্রামে যাতে কোনো বিপদ না আসে তাই 'রক্ষাকর্তা' অর্থাৎ 'ক্রুংফাং' এর উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে এই ব্রত করা হয়। গ্রামের কোনো খোলা জায়গায় বেদী প্রতিষ্ঠা করে সাতটি কলাপাতায় রান্না করা ভোগ (ভাত, মাংস) নিবেদন করা হয়। হজাই সমস্তরকমের পূজার নিয়ম সম্পন্ন করার পর রান্না করা ভোগ গ্রামের সবাইকে প্রসাদ হিসেবে প্রদান করেন।

ডিমাছা জীবনাচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুজো ও ব্রত পালনের সঙ্গে কিছু যেসব আচার-বিধি প্রচলিত তা অনার্য গোষ্ঠীর আচার অনুষ্ঠানের প্রতিফলন। বস্তুত ডিমাছা লোকজীবনে এইসব তন্ত্র-মন্ত্র সদৃশ পূজা পদ্ধতির প্রচলন তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র :

১. **Gait, Sir Edward, 'A History of Assam', Surjeet Publication, Delhi, 2004,** পৃঃ ৩০৯

২. তদেব, পৃঃ ৩০৯

৩. ভট্টাচার্য, অমলেন্দু, দেবলস্কর সঞ্জীব সম্পাদিত, শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', পারুল প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৬, পৃঃ ৭৫

৪. তাপাদার, জাহিদ আহমেদ, 'ডিমাছা অন্বেষা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, হাফলং, ১৯৯৬, পৃঃ ১৬

৫. **Endle Sidney, 'The Kacharis', Low Price Publications, Delhi, Reprinted, 2010,** পৃঃ ৩৩

৬. সিংহ, শ্রীকৈলাশচন্দ্র, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা, তৃতীয় অক্ষর সংস্করণ, মাঘ ১৪২০, পৃঃ ১৪৫

৭. নাথ, তুষারকান্তি, 'ডিমাছা সংস্কৃতির ইতিহাস', ভাষা সংস্কৃতির আকাদেমি, অসম, ২০০৬, পৃঃ ৩৮

৮. **Endle, Sidney, 'The Kacharis', Low Price Publication, Delhi, Reprinted, 2010,** পৃঃ ৩৫

৯. **Sen, Gouri, 'Life in Kachari Kingdom at Khaspur', Partha Datta, Vivekananda Road, Silchar, 2003,** পৃঃ

৬৮

১০. তদেব, পৃঃ ৭০

১১. তদেব, পৃঃ ৭৪

১২. বর্মণ, বিশ্বজ্যোতি, 'ডিমাছা বীর কিংবদন্তি পুরুষ শম্ভুধন ফাংলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি অন্যতম জাগরণ', ডিমাছা সাহিত্য সভা, ২০১৩, পৃঃ ৬০

১৩. বর্মণ, বিশ্বজ্যোতি, 'ডিমাছা বীর কিংবদন্তি পুরুষ শম্ভুধন ফাংলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি অন্যতম জাগরণ' গ্রন্থে কুমুদ চন্দ্র বডোর উদ্ধৃতি, পৃঃ ৬১

১৪. বর্মণ, সরোজকুমার, 'দ্যা হুডাং', সংখ্যা ২৫, ২০০১, পৃঃ ৩৩

১৫. **Barpujari, S.K., 'History of the Dimasas', Hemkosh Printers, Silpukhuri, Guwahati, 1997,** পৃঃ ১৪১

১৬. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, 'বাংলার ব্রত', বিশ্বভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, পৃঃ ১১